বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY
DHANBAD, JHARKHAND

পি এইচ.ডি. নিবন্ধীকরণের জন্য উপস্থাপিত সংক্ষিপ্তসার

SYNOPSIS FOR PH. D. REGISTRATION

শিরোনাম : দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীপরিচয় : উৎস, বিবর্তন ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব

TITLE: DEVIKENDRIK OPRODHAN MANGOLKABYER DEVI PORICHAY: UTSHO, BIBARTON O LOKOSANGOSKRITIR PROVAB

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : ড. রত্না কুমার

সহকারী অধ্যাপক, আর. এস. মোর কলেজ, গোবিন্দপুর

NAME OF THE SUPERVISER: DR. RATNA KUMAR

ASSISTANT PROFFESSOR, R.S. MORE COLLEGE, GOVINDPUR

গবেষকের নাম : অয়ন মুখোপাধ্যায়

NAME OF THE CANDIDATE: AYAN MUKHOPADHYAY

বাংলা বিভাগ

DEPARTMENT OF BENGALI

গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

SYNOPSIS FOR PH. D. REGISTRATION

- ১. ভূমিকা (*Introduction*) পৃ. ২
- ২. বিষয় নিরূপণ (*Statement of the Subject*) পৃ. ৩
- ৩. বিষয় অনুসন্ধান (*Subject to be Investigated*) পৃ. ৩
- ৪. গবেষণার লক্ষ্য (*Object of the Research*) পৃ. ৪
- ৫. পূর্ব অনুমান (*Hypothesis*) পৃ. ৪
- ৬. গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (*Research Design and Methodology*) পৃ. ৫
- ৭. তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ (*Tools to be used in the collection of Data and Analysis*) পৃ. ৬
- ৮. সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (*Significance of the Proposed Work*) পৃ. ৭
- ৯. বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের উপযোগিতা (*Contribution of the Existing Knowledge*) পৃ. ৮
- ১০. ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (*Future Possibility*) পৃ. ৯
-
- ১১. বিস্তারিত অধ্যায় বিভাজন (*Detailed Chapter Division*)
  - ভূমিকা : প্রাক্‌ভাষ (Introduction : Prakbhas) পৃ. ১০
  - প্রথম অধ্যায় : অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ বিচার (First Chapter : Oprodhan Mangalkabyer Swarup Bichar) পৃ. ১১
  - দ্বিতীয় অধ্যায় : শিবপত্নী মহাশক্তিকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের ধারা (Second Chapter : Shibopotni Mahasaktikendrik Mangalkabyer Dhara) পৃ. ১৩
  - তৃতীয় অধ্যায় : পৌরাণিক দেবীদের জয়যাত্রা (Third Chapter: Pouranik Debider Joyjatra) পৃ. ১৯

➢ চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের দেবীদের স্বরূপবিচার পৃ. ২৩
(Fourth Chapter: Onanya Debikendrik
Mangalkabyer Debider Swarupbichar)
➢ পঞ্চম অধ্যায় : বর্তমানের লোক-যাপনে
আলোচ্যমান মঙ্গলদেবীদের সামাজিক পরিগ্রহণ পৃ. ২৬
(Fifth Chapter: Bartoman Lok-Japone
Alochyoman Mangaldebider Samajik Porigrohon)
➢ উপসংহার পৃ. ২৯
(Conclusion)
➢ **১২. গ্রন্থপঞ্জি (*Bibliography*) পৃ. ৩০-৩৪**

আরম্ভ কথা

যৌথ পরিবারে একদা দিন শুরু হত ঠাকুমার মুখে ‘চৈতন্য চরিতামৃতে’র পাঠ শুনে। আর সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি কানে নিয়ে নিত্যদিনের যাপনে এক আশ্চর্য সংস্কারের মধ্যে বেড়ে ওঠা। সেই থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের, সংস্কৃতির প্রেমে পড়া। জানার আগ্রহ আর খোঁজার চেষ্টাকে পাথেয় করে প্রাক্-আধুনিকের কীটদষ্ট পুথির পাতায়, ভেঙে পড়া মন্দিরের অলঙ্করণে ইতিহাসকে প্রশ্ন করতে শুরু করা।

পরবর্তীতে সমস্ত আগ্রহ এসে কেন্দ্রীভূত হয় দেবীতত্ত্বের সন্ধানে। এর জন্য অবশ্য দায়ী অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শাক্তসাহিত্যের গোড়ার কথা বলতে বসে তিনি অবলীলায় প্রকাশ করেন অনন্ত শাস্ত্রনিচয়ের সারভূত এক মহাবাক্য – “মহাদেবীর বিচিত্র প্রকাশ”। সেই অনাদি-অনন্ত ‘এক’ নিজেকে দেখেছে নানা আয়নায়, নানা প্রতিবিম্বে। সেখানে অদ্ভুতভাবে একে অপরের মধ্যে সমীকৃত হয়ে রয়েছেন লক্ষ্মী ও জ্যেষ্ঠা। গঙ্গা আর চণ্ডী দ্বন্দ্ব ভুলে শিবকে আলিঙ্গন করে সামরস্যে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পাতাতেও সেই একই ছবি। মন্ত্রহীনের দেবীকে শিবসংলগ্না করে এক মহাদেবীর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একদিকে যেমন ‘জাতে তোলা’ হয়েছে সেই দেবীর আরাধ্যা জনগোষ্ঠীকে তেমনই সমান্তরাল ভাবে স্মার্ত-কাঠামোর বিধি নিষেধের প্রহরা ভেঙে দেবী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মন্ত্রবিবর্জিতের ব্রতে, আখ্যানে, যাপনে।

এই গবেষণা আসলে সেই পরম এক’কে নানা রূপে খুঁজে বেড়ানোর এক অভিপ্রায়। বুঝে নেওয়ার চেষ্টা বাংলার দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলগানে দেবীর পরিগ্রহণ। সবে যাত্রা শুরু, আশা এই সন্ধানে বেরিয়ে আসবে সেই বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যের ইতিহাস। শোনা যাবে, আদিপুরুষের মননের স্পন্দন।

বিনোদবিহারী মাহাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম – “দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীপরিচয় : উৎস, বিবর্তন ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব”। এই বিষয়টি নিবন্ধনের সুযোগ দিলে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রদ্ধাসহ,

তারিখ :

স্থান : আসানসোল।

অয়ন মুখোপাধ্যায়

১. ভূমিকা : (Introduction)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বঙ্গদেশের এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধার্মিক পরিসরে জাত এই বিশিষ্ট সাহিত্যধারায় একদিক দিয়ে যেমন প্রয়াস করা হয়েছে এতোকালের ব্রতবাহ্য সমাজের সঙ্গে ব্রতবিধানকারী উচ্চ ত্রৈবর্ণের প্রবর্তিত ও প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য অপনোদনের তেমনই সমান্তরাল ভাবে এই কাব্যধারাকে কেন্দ্র করেই শিবপত্নী মহাদেবীর সঙ্গে সমীকৃত হয়ে তথাকথিত ভাবে 'জাতে উঠেছেন' মন্ত্রহীনের দেবদেবীরা। একদিকে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে যেমন তথাকথিত নিম্নবর্গের দেবদেবীদের আত্মসাৎ করা হয়েছে বৃহত্তর 'হিন্দু' মান্যতার গণ্ডিতে তেমনই এই শাখার মধ্যে দেবলোকেও লেগেছে মর্ত্যজীবনের স্পর্শ।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যের জয়যাত্রা শুরু হয় মূলত মনসা ও চণ্ডী – এই দুই দেবীচরিত্রকে কেন্দ্র করে। মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচারক আখ্যানের সূত্র খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই জনচেতনায় প্রচলিত থাকলেও তাকে একটি নির্দিষ্ট কাব্যশরীরে উপস্থাপনের সূত্রপাত এই সময়েই। কিন্তু সময়ের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই এই দুই দেবীর পাশাপাশি মঙ্গলগানের আসরের দখল নিতে উঠে আসেন ষষ্ঠী, শীতলা, বাশুলী – প্রভৃতি দেবীরা। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' নামের মহাগ্রন্থে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই কাব্যগুলিকে শ্রেণিবিন্যস্ত করেছে "অপ্রধান মঙ্গলকাব্য" নামে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি একদিক থেকে সাহিত্যিক অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য। এই শ্রেণির মঙ্গলকাব্যগুলি কেবল পুরাণের শুকনো পাতায় ভিত্তি করে ক্ষমতাহীন কবিদের কলম চালনায় পর্যবসিত হয়েছে বলে তাঁর মত। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি কেবল হিন্দু পুরাণ-নির্ভর নয়।

প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের চরিত্র নির্ণায়ক বিশেষণ 'মিশ্রসত্ত দেবতা' – এই শব্দবন্ধটি এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 'মিশ্রসত্ত' বলতে আমরা মূলত চারটি উৎসের কথা বুঝে থাকি – ১. স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যধারা তথা পৌরাণিক ধারা, ২. হিন্দু তান্ত্রিক ধারা, ৩. বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারা, ৪. লোকায়ত বা জনজাতিক বিশ্বাসের ধারা।

দেবীকেন্দ্রিক প্রধান মঙ্গলকাব্য ধারার (মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা) মতোই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্র নির্মাণেও এই পূর্ব উল্লেখিত চারটি ধারার'ই প্রভাব বিদ্যমান। এই গবেষণায় সেই ধারাগুলির ভিত্তিতে এই দেবীদের গড়ে ওঠার বিচিত্র ইতিহাসকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হবে।

২. বিষয় নিরূপণ : (Statement of the Subject)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য। মধ্যযুগের প্রথম পর্বের মঙ্গলকাব্যগুলি মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও অন্ত-মধ্যযুগে (খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হতে শুরু করে সেখানে মনসা ও চণ্ডীকে সরিয়ে শীতলা, ষষ্ঠী, গোসানী – প্রভৃতি দেবীরা মুখ্য আরাধ্য হিসাবে উঠে আসেন।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্যে আরাধিত দেবদেবীর পূজা প্রচার ও প্রসার। এই পূজা প্রচার ও প্রসার করতে গিয়ে মঙ্গলদেবদেবীরা কখনও অকারণেই বরদান করেছেন (স্বর্ণগোধিকারূপিণী চণ্ডীর কালকেতুকে বরদানের অংশ স্মর্তব্য) আবার কখনও বা তাঁদের পূজা প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে বিনাদোষেই অভিসম্পাতিত হয়েছে স্বর্গের কোনো বাসিন্দা (ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের কাহিনি স্মর্তব্য)। এভাবেই কখনও প্রচণ্ডা আবার কখনও বরদা মূর্তিতে এই কাব্যধারায় প্রকাশিত হয়েছেন নতুন প্রতিষ্ঠা-সন্ধানী দেবদেবীরা।

প্রথমপর্বে মনসা, চণ্ডীর আধিপত্যকে সরিয়ে স্মৃতি-শাসিত, ধর্মনির্ভর সমকালীন বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে কীভাবে শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী – প্রভৃতি দেবীরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছেন এবং সেই দেবীরা কোন সনাতনী ঈশ্বরভাবনার পথে বিবর্তিত হয়ে তৎকালীন সেই নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করছেন, তা নিরূপণই এই গবেষণার মুখ্য সমস্যা।

৩. বিষয় অনুসন্ধান : (Subject to be Investigated)

মধ্যযুগের দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের উৎস বিচার আমাদের গবেষণার মূল বিষয়। তাই মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বে রচিত এই দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যগুলির আখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত দেবীদের বর্ণনা ও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত সেই দেবীদের দেবতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা এই গবেষণার অন্যতম মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মিশ্রসত্ত প্রকৃতির। এই দেবীদের পরিকল্পনায় স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য ধারা তথা পৌরাণিক ধারার সঙ্গে এসে মিশেছে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধারা। সমান্তরাল ভাবে লোকায়ত বা জনজাতিক বিশ্বাসের ধারা থেকে নানা উপাদানকে সাঙ্গীকৃত করে গড়ে উঠেছে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীতত্ত্ব। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির দেবীচরিত্র নির্মাণেও এই চারটি ধারারই প্রভাব বিদ্যমান। ধর্মশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই দেবীবর্গের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত নির্ণয় ও আলোচ্যমান মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রতিফলিত রূপের সঙ্গে সেই রূপের সম্পর্ক স্থাপনই বর্তমান গবেষণার অন্বিষ্ট।

৪. গবেষণার লক্ষ্য : (Object of the Research)

সাহিত্য (*Literature*) ও ধর্মতত্ত্ব (*Theology*) সংস্কৃতির দু’টি মৌল উপাদান। নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই উপাদানগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বজাত বিশেষ অবস্থাই সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত। সেই সংস্কৃতিরই অন্যতম অভিজ্ঞান সাহিত্য। তাই সাহিত্যের বিশ্লেষণে সংস্কৃতির বিশ্লেষণ একান্তভাবে জরুরি।

মধ্যযুগের শেষপর্বে তথা চৈতন্য পরবর্তী সময়কালে (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব) এক বিশেষ সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য গুলিকে হাতিয়ার করে মনসা, চণ্ডীর মতো মঙ্গলকাব্যের দেবীদের সরিয়ে মঙ্গলগানের আসরের দখল নেন শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি তথাকথিত লৌকিক দেবীরা। এই সময়পর্বেই লক্ষ্মী, সরস্বতীর পৌরাণিক দেবীদের নিয়েও একাধিক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির অন্তর থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে গঙ্গামঙ্গলের ফল্গুধারা। পাশাপাশি চণ্ডী নামের দেবীসত্তার ভয়ঙ্করী রূপকে দূরে সরিয়ে শিবপত্নী পরিগ্রহ করেছেন দুর্গার ঐশ্বর্য মূর্তি, কখনও বা বাঙালি হৃদয়ের সহজ ভালোবাসা থেকে প্রকাশিত হয়েছে গৌরীর মঙ্গলগান। আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ গানের সুরে গলায় তুলে নিয়েছে ‘শ্যামা নামের কবচমালা’।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এই বিশেষ সময়পর্বে রচিত দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্য গুলিতে প্রতিফলিত দেবীচরিত্রগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. পূর্ব অনুমান : (Hypothesis)

গবেষণা অভিসন্দর্ভে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের উৎসবিচার করার প্রয়াস করা হবে। মধ্যযুগের বঙ্গদেশের বিশিষ্ট জীবনাচরণের প্রেক্ষিতে এই কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। সেই বিশিষ্ট অবস্থান পর্যালোচনা করে এই অভিসন্দর্ভে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরাণিক ধারা, হিন্দু তন্ত্রের ধারা, বৌদ্ধতন্ত্রের ধারার ধর্মশাস্ত্রে দেবীদের যে দেবতত্ত্বের বর্ণনা উপদেশিত হয়েছে তার সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রতিফলিত দেবীস্বরূপের তুলনামূলক বিচার করা হবে।

এই বিচারে ধর্মশাস্ত্রের দেবীদের সামাজিক পরিগ্রহণের নানা রূপ ও সেই পরিবর্তন, পরিগ্রহণ-পরিমার্জনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হবে। সমান্তরাল ভাবে এই দেবীদের স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ লৌকিক দেবীদের সংস্কৃতায়নের দিকটিও বোঝার প্রয়াস করা হবে।

৬. গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি : (Research Design and Methodology)

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি *(Historical Method)* অনুসারে মঙ্গলকাব্যগুলিকে সময়ানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করা হবে এবং যে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই কাব্যগুলি রচিত হয়েছে তার পরিচয় সন্ধান করার প্রয়াস করা হবে। পরবর্তী স্তরে পাঠ সমালোচনা পদ্ধতি *(Textual Criticism)* অনুসরণে পাঠ্যের নিবিড় পাঠের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত দেবীদের রূপটিকে বোঝার চেষ্টা করা হবে। এরপর তুলনামূলক পাঠতত্ত্বের *(Comparative Criticism)* আলোকে মূল সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রের পাতায় এই দেবীদের কীভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে – তা অনুসন্ধান করা হবে।

মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের *(Marxist Criticism)* সৌধ ও উপরিকাঠামো *(Base and Super-Structure)* তত্ত্বকে ব্যবহার করে আমরা সমাজের উপরিকাঠামোর দুটি প্রভাবক হিসাবে সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বকে চিহ্নিত করছি এবং শেষ পর্বে সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার *(Cultural Studies)* নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বোঝার চেষ্টা করা হবে, কীভাবে একটি বিশেষ ধর্ম-নির্ভর সংস্কৃতির নানা চিহ্ন এই সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

গবেষণা নিবন্ধে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে *আকাদেমি বানান অভিধান* এবং ইংরাজি বানানের ক্ষেত্রে *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*-এর

নির্দেশ মান্য করা হবে। সমস্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেই মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হবে। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির নীচে বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হবে। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি রচনার কাজে *MLA Handbook for Writers of Research Papers (Seventh Edition)*-এর নির্দেশ মান্য করা হবে।

গবেষণার অধ্যায় বিভাজন ও পরিকল্পনা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

৭. তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ : (Tools to be used in the collection of Data and Analysis)

বর্তমান গবেষণাকর্মটি মুখ্যত সাহিত্যের টেক্সটের বিশ্লেষণ নির্ভর একটি প্রকল্প। তাই এই গবেষণায় বৈজ্ঞানিক কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান গবেষণায় প্রাচীন পণ্ডিতদের সম্পাদিত আকরগ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্রের প্রচলিত রীতি-নীতি ও সংকলন কোষের ব্যবহার করা হবে। মুখ্যত ছাপা বইয়ের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের আকর সন্ধান করব। ক্ষেত্র বিশেষে, বিশেষত মধ্যযুগের শেষ পর্বের মঙ্গলকাব্যগুলির ক্ষেত্রে আমরা মূল পুথিগুলিও যত্নের সঙ্গে পুনর্বিবেচনা করব। সেই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

ইংরাজি ভাষার কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে ও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কিছু মঙ্গলকাব্যের টেক্সটের ক্ষেত্রে অন্তর্জালের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়া আন্তর্জালিক বিভিন্ন লাইব্রেরি (আর্কাইভ.ওরগ, জে স্টোর) ব্যবহার করা হবে। কিছু কিছু গবেষণা কর্মের প্রকাশিত পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ না থাকার কারণে বিদেশি প্রকাশনার বইয়ের সফট্ কপি ব্যবহার করা হবে।

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি গবেষকের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে উইন্ডোজ ২০০৭ প্ল্যাটফর্মে মাইক্রোসফট্ ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেসনে অভ্র কিবোর্ড ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি পুথিচিত্র, পাটাচিত্র ও দেবীদের নানা চিত্র সংযোজন করার ক্ষেত্রে গবেষকের ব্যক্তিগত নিকন ডিজিট্যাল ক্যামেরার ছবি ব্যবহার করা হবে। কিছু ক্ষেত্রে শিল্পী অর্ঘ্যদীপ্ত করের আঁকা দেবীদের শাস্ত্রীয় প্রতিকৃতি ডিজিট্যালি স্ক্যান করে গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা হবে।

৮. সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব : (Significance of the Proposed Work)

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বে রচিত দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ধারার দেবীদের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হবে। বাংলা বিদ্যাচর্চার জগতে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা) দেবদেবীদের স্বরূপ সন্ধান প্রসঙ্গে একক বা মিলিত গবেষণাকর্ম পূর্বেই সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখিত মঙ্গলকাব্যগুলির টেক্সটের সম্পাদিত পাঠ প্রস্তুত করে প্রকাশ করার সময় পূর্বতন আচার্যমণ্ডলী সেই দেবী বা দেবতার উৎস সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি। অধিকাংশ অপ্রধান মঙ্গলকাব্য বহুদিন পূর্বে (কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বতন প্রকাশনার শতাধিক বছর অতিক্রান্ত) একবারের জন্য মুদ্রিত হলেও সেই মুদ্রণের পরিকল্পনা ও ভূমিকা সংযোজনা একেবারেই অপরিকল্পিত। এছাড়া প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের পূজার্চনার ধারা (কাল্ট) আজও সমকালীন সমাজে প্রচলিত থাকায় তাঁদের স্বরূপ চিহ্নিত করতে ও ধারাকে বুঝতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে একদিকে যেমন সমকালীন সমাজে সেভাবে অনালোচিত দেবীদের (গোসানী, বাশুলী) স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস করা হবে তেমনই সেইসমস্ত দেবীদের উৎসের খোঁজেও মনোনিবেশ করা হবে যারা বর্তমানে স্বতন্ত্র সত্তায় অর্চিত না হয়ে অন্য কোনো দেবতার শক্তি (গঙ্গা,লক্ষ্মী) হিসাবেই সমাজ-পরিচিতি লাভ করেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে সেই দেবীদের মূল সত্তার সঙ্গে বর্তমান সামাজিক পরিচিতির কোন সম্পর্কই আর আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, সরস্বতী। বৈদিক সাহিত্যের জনজীবনের প্রাণদাত্রী, অন্নদাত্রী সরস্বতী নদীর উপাসনা আজ বঙ্গদেশে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীর বন্দনায় পরিণত হয়েছে।

অনাদিকালের প্রায় অপরিণত সমাজ ব্যবস্থায় ভয়ে-ভক্তিতে মানুষ প্রথম যেদিন ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিল তখন তাঁর রূপ ছিল খুবই আদিম ও প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সমাজ দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ লাভ করেছে। বদলেছে জীবনধারণের রীতিনীতি, বদলেছে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা। তাই দেবী চরিত্রগুলিও ক্রমশ তাঁদের পূর্বতন রূপের নির্মোক ত্যাগ

করে নতুনতর রূপে, নতুনতর স্বভাবে বিবর্তিত হয়েছেন। আর সমাজের দর্পণ সাহিত্যেই গেঁথে রাখা হয়েছে সেই বিবর্তনের ইতিহাস। তাই আজকের এই একুশ শতকের বুকে দাঁড়িয়ে এই অভিসন্দর্ভে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হবে বঙ্গদেশের আদিমতম সময়ের সেই বাতাবরণকে যেখানে মঙ্গলদেবীরা ক্রমশ রূপায়িত হচ্ছেন ধর্মশাস্ত্রে-সাহিত্যে।

৯. বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের উপযোগিতা :

(Contribution of the Existing Knowledge)

সমগ্র গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণের প্রথমেই একটি স্তর থাকে যেখানে প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান জন্ম দেয় নতুনতর প্রশ্নের ও সেই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার ফলেই জন্ম নেয় গবেষণা করে সেই উত্তর খুঁজে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ পত্র পড়তে এসে প্রথমেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসাবে হাতে আসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" নামের গ্রন্থসমূহ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "চণ্ডীমঙ্গল" শীর্ষক অধ্যায়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে উল্লেখমাত্র করেছেন। পরে তৃতীয় খণ্ডে "মঙ্গলকাব্য" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি মাত্র মঙ্গলকাব্যের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে তাঁর আলোচনায়।

একই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক সুকুমার সেনের কথা। তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" শিরোনামাঙ্কিত মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অধ্যাপক সেনও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের কথা আলোচনা করলেও তা সম্পূর্ণ নয়।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়ার ও বোঝার ক্ষেত্রে আরেকটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক খ্যাতনামা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস"। এই গ্রন্থে অধ্যাপক ভট্টাচার্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির রচনাকাল, কবিবর্গ, আখ্যান অংশের বিস্তারিত বিবরণ দিলেও তিনি যে গুরুত্ব দিয়ে প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের উৎসবিচার করেছেন অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব আরোপ করেননি। সামান্য রেখাচিত্রে এইসমস্ত দেবীদের ইতিহাসের সামান্যতম ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া গেলেও তা যথেষ্ট নয়।

সমকালের বাংলা বিদ্যাচর্চার মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান তথা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর বেশ কয়েকটি কালিকামঙ্গল সম্পাদনা করে পুনঃপ্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধারে তাঁর কাজ বিপুল প্রশংসার যোগ্য হলেও সেই সমস্ত গ্রন্থেও অধ্যাপক নস্কর দেবীদের উৎসবিচারে সেই পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেনি।

অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা লিখিত "হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ : আদি-মধ্যযুগ" গ্রন্থেও মধ্যযুগের সাহিত্য ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হলেও সেই মঙ্গলকাব্যগুলির দেবীদের সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

১০. ভবিষ্যতের সম্ভাবনা : (Future Possibility)

প্রথমত, সমগ্র গবেষণাকর্মটির ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীদের আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সমকালের সমাজবাস্তবতার বিশ্লেষণ এই অভিসন্দর্ভে থাকলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে এই দেবীদের উৎস বিচারে সামাজিক বিবর্তনের দিকটি পৃথক ভাবে বিশ্লেষণের সম্ভাবনা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, এই অভিসন্দর্ভে দেবীকেন্দ্রিক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির দেবীদের উৎসবিচারের প্রয়াস করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যযুগের অন্ত্য পর্বে নানা দেবকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যও (কৃষ্ণমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল) রচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলির বিশ্লেষণের সম্ভাবনা থাকবে।

তৃতীয়ত, এই প্রকল্পের অন্তর্গত দেবীদের বর্তমান সমাজে পরিগ্রহণ এই অভিসন্দর্ভের আলোচনার পরিধির অন্তর্গত নয়। তাই খ্রিস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের প্রতিপত্তির সন্ধানরত দেবীদের সমকালে পরিগ্রহণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের সুযোগ থাকবে।

পরবর্তীতে এই অভিসন্দর্ভের বিস্তারিত অধ্যায় পরিকল্পনা আলোচনা করা হল।

ভূমিকা : প্রাক্‌ভাষ

(Introduction : Prakbhas)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শুরুতেই এই পর্বে গবেষণার বিষয় নির্বাচনের কারণ ও প্রেক্ষিতের কথা আলোচনা করা হবে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান ধারা। সেই বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের এক নির্দিষ্ট পরিসরকে কেন্দ্র করে আমাদের অনুসন্ধান।

এই পর্বে আলোচ্যমান অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিকে এই অভিসন্দর্ভে কীভাবে শ্রেণি বিন্যস্ত করা হবে – সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞানের কোন কোন শাখাগুলি বর্তমান গবেষণায় ব্যবহার করা হবে তারও উল্লেখ থাকবে এই পর্বে।

গবেষণাকর্মে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে তাঁদের উল্লেখ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনও এই পর্বে সংকলিত হবে। গবেষণা কর্মের অন্তর্গত ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত-ও এই পর্বে প্রদান করা হবে।

প্রথম অধ্যায় : অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ বিচার

(First Chapter : Oprodhan Mangalkabyer Swarup Bichar)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বঙ্গদেশের মঙ্গলগানের আসরের সিংহাসনের অধিকার নিয়েছিলেন চণ্ডী, মনসা, ধর্মের মতো দেবদেবীরা। কিন্তু এর একশো বছরের মধ্যেই তাঁদের অধিকার আর নিরঙ্কুশ রইল না। বাঙালির মনের ও কবিতার আসরের দখল নিতে উঠে এলেন ষষ্ঠী, শীতলা, বাশুলীর – মতো দেবীরা। তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে মঙ্গলকাব্য সমূহ রচিত হয়, সেগুলিই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অপ্রধান মঙ্গলকাব্য' নামে চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার তাঁর অসামান্য পর্যবেক্ষণে সমকালের বাঙালির যাপনের সঙ্গে এই মঙ্গলকাব্যের আত্মিক যোগটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি বাক্যের পরিধিতে – "এই সময়ে লোকজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লোকধর্মাবলম্বী নানা ধরনের মঙ্গলকাব্য রচিত হওয়াই সম্ভব।" [১]

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, অপ্রধান মঙ্গলকাব্য "সাহিত্যিক অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য"।[২] এই ধারার মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের শুকনো পাতায় ভিত্তি করে ক্ষমতাহীন কবিদের কলম-চালনা মাত্র। প্রধান মঙ্গলকাব্যের মতোই এই অপ্রধান মঙ্গকাব্যের ভুবন রচনার ক্ষেত্রেও – ১. স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য ধারা তথা পৌরাণিক ধারা, ২. হিন্দু তান্ত্রিক ধারা, ৩. বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারা, ৪. লোকায়ত বা জনজাতিক বিশ্বাসের ধারা – এই চারটি ধারার গভীর যোগ পাওয়া যায়। এমনকি দেবীকেন্দ্রিক প্রধান মঙ্গলকাব্য ধারার (যেমন – মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা) মতোই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্র নির্মাণেও এই পূর্ব উল্লেখিত চারটি ধারার'ই প্রভাব বিদ্যমান। এই গবেষণায় সেই ধারাগুলির ভিত্তিতে এই দেবীদের গড়ে ওঠার বিচিত্র ইতিহাসকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই প্রারম্ভিক অধ্যায়ে 'অপ্রধান মঙ্গলকাব্য' বলতে আমরা ঠিক কোন কোন মঙ্গলকাব্যগুলিকে চিহ্নিত করছি এবং কেন করছি – এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হবে। বুঝে নেওয়ার প্রয়াস করা হবে এই গবেষণার সীমানা পরিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিবপত্নী মহাশক্তিকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের ধারা
(Second Chapter : Shibopotni Mahasaktikendrik Mangalkabyer Dhara)

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সনাতনী সংস্কৃতি আদিতে এক মহাদেবীর পরিকল্পনা করে থাকলেও পরবর্তী সময়ে সেই মহাদেবীর রূপকল্পনা থেকেই মূর্তি পরিগ্রহ করেন নানা শক্তিদেবীরা।[৩] তবে একথা প্রথমেই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এই মহাদেবী সমীকৃত হয়েছেন শিবপত্নী উমা-হৈমবতীর সঙ্গে। তাই স্মার্ত-পৌরাণিক পরম্পরায় যে দেবী শিবপত্নী নন, তিনি মহাদেবী নন। আবার তন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষের চারটি অপবর্গ প্রদানে যিনি সদা-তৎপরা তিনিই মহাদেবী তথা মহাবিদ্যা। *মহানির্ব্বাণ তন্ত্র* ও *তন্ত্রসারাদি* গ্রন্থ দশ-মহাবিদ্যার কথা বললেও *বৃহন্নীল তন্ত্র* এই মহাবিদ্যার নামের তালিকায় আরও আটজন মহাবিদ্যাকে সাঙ্গীকৃত করে অষ্টাদশ মহাবিদ্যার তালিকা প্রকাশ করেছে। বঙ্গদেশের প্রামাণ্য তন্ত্রশাস্ত্র *প্রাণতোষিণী তন্ত্র*-এর নির্দেশ –

“কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।”[৪]

মূল ধারার মঙ্গলকাব্যের আঙিনায় শিবপত্নী চণ্ডীর মাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্যসম্ভার রচিত হলেও মহাদেবীদের অন্যান্য লীলা-বিগ্রহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যশাখায়। এই অধ্যায়ে সেই শিবপত্নী মহাদেবীর নানা রূপের যে প্রকাশ অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে – তার বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হবে।

➢ ক. কালিকামঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী কালিকা (Kalikamangal Kabyadhara o Debi Kalika)

অপ্রধান মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম জনপ্রিয় শাখা কালিকামঙ্গল। কঙ্ক, শ্রীধর, প্রাণরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী শা’বারিদ খাঁ-এর মতো কবিও কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গদেশের প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব হলেও বঙ্গদেশের হৃদয়রাজ্যে শ্মশানবাসিনীর একচ্ছত্র অধিকার। বঙ্গদেশে কালিকার এই জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি প্রকাশ পায় *ব্রহ্মযামল তন্ত্র*-এর সাক্ষ্যে। সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অধিশ্বরী দেবীর তালিকায় বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে – “কালিকা বঙ্গদেশে চ গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী”।[৫] কালিকামঙ্গল কাব্যধারার মূলসূত্রগুলির অন্যতম

মুখ্য উপাদান *চৌর-পঞ্চাশিকা*-র উল্লেখ সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া গেলেও বঙ্গদেশে এই দেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও স্মার্ত রঘুনন্দন বর্ষকৃত্য বিচার করতে বসে *তিথিতত্ত্বম্* গ্রন্থে নানা তান্ত্রিক উৎসবকে অবশ্যপালনীয় বর্ষকৃত্যে স্থান দিলেও দীপান্বিতা অমাবস্যায় কেবল লক্ষ্মী-ইন্দ্র ও কুবেরের পূজা বিধান দিয়েই পর্বকৃত্যের আলোচনা সাঙ্গ করেছেন। পরবর্তী শতাব্দীর স্মার্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *শ্যামাসপর্যা বিধি* গ্রন্থের সাক্ষ্যে এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশের অবশ্য পালনীয় উৎসবের মধ্যে স্থান পায় দেবী কালিকার পূজা। সমান্তরাল ভাবে এই সময়েই রচিত হতে থাকে নানা 'কালিকামঙ্গল কাব্য'।

ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ ও মঙ্গলকাব্যের পাতা মিলিয়ে দেখে এই অধ্যায়ে বোঝার প্রয়াস করব কীভাবে প্রাগার্যযুগের মাতৃকাদেবী বৈদিক যুগের হোমাগ্নির এক জিহ্বায় পরিণত হয়ে ক্রমশ বিবর্তিত হলেন বর্তমান মূর্তিতে। বঙ্গহৃদয় ধারণ করল শ্যামা নামের কবচমালা।

➢ খ. দুর্গামঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী দুর্গা (Durgamangal Kabyadhara o Debi Durga)

বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মাটির গন্ধ। নদী-নালা-শ্যামলিমায় ঢাকা বঙ্গদেশে তাই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পরমাপ্রকৃতিও পরিণত হন পরমস্নেহের কন্যায়। বঙ্গদেশের মাতৃভাবনা দেবীকেও কন্যা রূপে ফিরে পেতে চায় নিজের একান্ত ক্রোড়ে। তাই শাক্ত-পদাবলীতে মা মেনকা সরাসরি প্রত্যাখান করেন দেবীর ঐশ্বর্য্য মূর্তিকে। বরং বঙ্গদেশের সজল মাতৃহৃদয় হীনঅন্ন-ভগ্নআশ পল্লিগ্রামের মেটে বাড়ির কন্যাটির মতোই তার ঘরের দুলালী উমার মধ্যে দেখেছে "মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী"।

একদিকে শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে যেমন বেজে উঠেছে দীনা-হীনা কন্যার জন্য মাতৃহৃদয়ের বিধুর বাঁশরি তেমনই সমকালেই কিন্তু এই স্রোতের বিপরীতে দুর্গামঙ্গল কাব্যগুলিতে আবার প্রকাশিত হয়েছে দেবীর অপার ঐশ্বর্য্যমূর্তি। *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* আখ্যান নির্ভর এই মঙ্গলকাব্যধারার অনেক রচনায় সম্পূর্ণত বা মুখ্যত শ্রীশ্রী সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। আবার কখনও কখনও হিন্দু বাঙালির শাক্ত-যাপনের দুই দেবী – দুর্গা ও কালিকা সমীকৃত হয়েছেন এই সময়পর্বে রচিত মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে।

“হরিনাভিকমলে বিধাতা সেইকালে। / বিধিরে হানিতে দৈত্য অচিরাত চলে।।
যোগনিদ্রা মহাকালী তুমি সে কারণ। / অখিল ভুবনপতি নহে সচেতন।।
সভয়ে মানসে স্তুতি কৈলা পদ্মযোনি। / নারায়ণে সচেতন কৈলে নারায়ণী।।”[৬]

ধর্মশাস্ত্র ও মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এই উপ-পরিচ্ছেদে সন্ধান করা হবে দেবী দুর্গার মূল স্বরূপ ও মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত স্বরূপের সাযুজ্য ও প্রতিসরণকে। সেই আলোচনায় একদিকে যেমন উঠে আসবে পৌরাণিক সাহিত্যের কাত্যায়নীর কথা তেমনই সুদূর সাগরপারের গ্রিক সিংহবাহিনী দেবীর প্রসঙ্গও ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াস করা হবে।

➢ গ. গৌরীমঙ্গল কাব্য ও দেবী গৌরী
(Gourimanga Kabya o Debi Gouri)

অপ্রধান দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যধারায় বিশেষ সংযোজন পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র রচিত ‘গৌরীমঙ্গল’ কাব্য।[৭] দুর্গামঙ্গল কাব্যগুলির বিপরীতে এই কাব্যে যেন লেগেছে শাক্ত-পদাবলীর তত্ত্বদৃষ্টির স্পর্শ। তাই এই কাব্যে হিমালয়-নন্দিনী গৌরীর মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে সমকালীন বঙ্গদেশের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির এক গগনস্পর্শী দ্বন্দ্বের ছবি। এই কাব্যটি তাই এই উপ-পরিচ্ছেদে পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। বাঙালি ধর্মশাস্ত্রের জটিল বিধি-বিধানকে সরিয়ে তাঁদের মানবায়ন ঘটিয়েছে। এই মানবায়নের প্রধান মাধ্যম অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। এই ধারাই পরবর্তী ক্ষেত্রে শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গৌরীমঙ্গল কাব্যটি রচনাকালের দিক থেকে ‘আধুনিক’ সময়ের হলেও পরম্পরার ও কাব্য সংরূপের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই কাব্যটিকেও আমরা গ্রহণ করছি।

➢ ঘ. বাশুলীমঙ্গল কাব্য ও দেবী বাশুলী
(Bashulimangal Kabya o Debi Bashuli)

স্মার্ত-হিন্দু ধারার সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতেই হিন্দু-তন্ত্রের যৌগপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়াবধি বঙ্গদেশের মান্যতম স্মার্ত রঘুনন্দন তান্ত্রিকী দীক্ষাকে স্বীকার করার মধ্যে দিয়ে হিন্দু-তন্ত্র ও হিন্দু-স্মার্ত ব্যবস্থার সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়। আর তাঁর হাত ধরেই নানান তান্ত্রিক দেবীদের স্মার্ত মুখোশের আড়ালে সমাজ গ্রহণ করতে শুরু করে। এই সামাজিক-ধর্মীয় পালাবদলের ইতিহাসই গ্রথিত হয়ে আছে ‘বাশুলীমঙ্গল’ কাব্যে।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, 'বাশুলী' এই নাম সাযুজ্যে দেবী মুখ্যত 'বিশালাক্ষী'।[৮] আবার অন্যমতে দেবী স্বরূপত তৃতীয়া মহাবিদ্যা পরাভট্টারিকা 'ত্রিপুরসুন্দরী'। কাব্যের শরীরে আবার লক্ষ করা যায় যে, তিনি নরপ্রেত আসনা; যা আসলে কালী ও তারা পর্যায়ের দেবীদের অন্যতম প্রধান চিহ্ন। আবার এই কাব্যে দেবী সমীকৃত হয়েছেন শারদীয়া দুর্গার রূপে –

"গণনাথ গজমুখ তারকারি কার্ত্তিক
হিমালয় ঝিয়ারিনন্দন।
বসিল দেবীর কাছে ময়ূর মূষিক নাচে
হরিলেক দেবতার মন।। ...
একত্র বাসব বিধি হরি হর করে স্তুতি
দুই পাশে কমলা ভারতী।।[৯]

পূর্ববর্তী আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে বাশুলী দেবীর চরিত্রের মধ্যে রেখাপাত রয়েছে নানা মহাবিদ্যার রূপকল্পনার। তাই এই উপ-অধ্যায়ে বাঙালির সমকালীন সময়পর্বের ধর্ম-যাপনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাশুলী দেবীর স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হবে।

➢ ঙ. গোসানীমঙ্গল কাব্য ও দেবী গোসানী (Goshanimangal Kabya o Debi Kalika)

কামতাপুরের খেন রাজপরিবারের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে গোসানীমঙ্গল কাব্যের আখ্যান শরীর। কাব্যটিতে আরাধ্য দেবী দুর্গা-চণ্ডীর সমপর্যায়ভুক্ত হলেও এই কাব্যের ধারা প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আখ্যানভাগকে আশ্রয় না করে একান্ত ভাবে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে।[১০]

প্রসঙ্গত আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখের দাবি রাখে তা হল – অন্যান্য মঙ্গল দেবদেবীদের মতো দেবী গোসানী কখনই নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচণ্ডা রূপ ধারণ করেননি, বরং অভয়া ও বরদা স্বভাব লক্ষণই সমস্ত কাব্য জুড়ে দেবীর মূল ভাব। তাই আঞ্চলিক রাজপরিবারের আরাধ্যা কুলদেবীকে নিয়ে রচিত এই মঙ্গলকাব্যটির দেবীর স্বরূপ সন্ধান ঠাঁই পেয়েছে আমাদের আলোচ্যমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই উপ-অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় : পৌরাণিক দেবীদের জয়যাত্রা
(Third Chapter: Pouranik Debider Joyjatra)

অপ্রধান মঙ্গলকাব্যকে সমালোচকেরা পৌরাণিক ধারারই অনুবর্তন বলে মনে করেছেন। এই অধ্যায়ে দেবীদের মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যের বিশ্লেষণে স্মার্ত-পৌরাণিক দেবীচরিত্রগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের ধারায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন, তা বোঝার চেষ্টা হবে। এই অধ্যায়ে যে দেবীদের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে তাঁরা মুখ্যত পুরাণ আশ্রিত হলেও কাব্যে এই দেবীদের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বঙ্গদেশের নিজস্ব। এই স্বাতন্ত্র্যের কথাটিই আলোচনা করা হবে।

- **চ. গঙ্গামঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী গঙ্গা**
  (Gangamangal Kabyadhara o Debi Ganga)

হিন্দু বাঙালির যাপনের এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ গঙ্গা। শুদ্ধতা-নির্মলতার প্রতীক দেবী গঙ্গা। শঙ্করাচার্যের যে কয়েকটি স্তোত্র-বন্দনা আজও প্রচলিত সেইগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল 'গঙ্গাবন্দনা'।[১১] তাই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে আখ্যান রচনা সভ্যতার সেই আদি থেকেই বাঙালির উত্তরাধিকার। সমান্তরাল ভাবে গাঙ্গেয় অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনের শস্য ও সমৃদ্ধির উৎসও তিনি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় তাই পুরাণের ছায়াপাত ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের হৃদয় হতে উৎসারিত হয়েছে গঙ্গা বন্দনা। এই উপ-অধ্যায়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রচিত গঙ্গামঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে দেবী গঙ্গার স্বরূপটিকে।

- **ছ. লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী লক্ষ্মী**
  (Lokkhmimangal Kabyadhara o Debi Lokkhmi)

বাঙালির বিত্ত-সাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম আখ্যান সূত্র সমৃদ্ধিশালী বাঙালি বণিকের সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে বাণিজ্য যাত্রার ইতিবৃত্ত। সেখানে পণ্যের ও বিপননের যে তালিকা পাওয়া যায় তার থেকে সমকালের বঙ্গদেশের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা একান্ত ভাবে এক অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত সমাজের ছবি। সেখানে মঙ্গলকাব্যের আখ্যান শরীরে যে আরাধ্যা দেবীকে স্তুতি করে মঙ্গলকাব্য রচিত হচ্ছে সেই দেবীই প্রাথমিক ভাবে পূজা প্রসারের জন্য প্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করলেও কাব্যের শেষে তাঁর পূজা প্রচারিত হলে তিনিই প্রকাশিত হন ধনদা-বরদা রূপে।[১২] (স্মর্তব্য, 'মনসামঙ্গল'-এর আখ্যানে শুরুতে মনসার কোপেই চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা জলে নিমজ্জিত হয়; আবার কাব্যের অন্তে সেই মনসার দাক্ষিণ্যেই চাঁদ ফিরে পান তাঁর হৃত ঐশ্বর্য।)

কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে একান্তভাবে লক্ষ্মীদেবীকে কেন্দ্র করেও লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যখ্যাপক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। এই লক্ষ্মী কিন্তু বাণিজ্যযাত্রার লক্ষ্মী নন, বরং এই পর্বে ধান্যলক্ষ্মী ও শস্যলক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।[১৩] স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া যায় যে, বহির্বাণিজ্য থেকে এই সময়পর্বে (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) বাঙালির অর্থনৈতিক উদ্যোগের মোড় ঘুরে গেছে কৃষির দিকে। তৈরি হচ্ছে স্বয়ম্ভর গ্রাম আর সেই গ্রামকে ধনধান্যে 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করছেন দেবী লক্ষ্মী।

কবি নিত্যানন্দের 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা'য় এই দিকটিই একান্তভাবে ফুটে উঠেছে।[১৪] 'ধন্যা চণ্ডাল পালা'য় একান্ত অভাবে আর কিছুই না পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় তারা যখন ঘরে কলমীশাক ফুটিয়ে খাচ্ছে তখন দেবী লক্ষ্মী ও নারায়ণ তাদের অভাব দেখে ব্যথিত হয়ে দর্শন দেন ও বরদান করেন। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই উপ-অধ্যায়ে দেবী লক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গল আখ্যানের ভিত্তিতে দেবীর এই শস্যময়ী মূর্তির উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হবে।

➢ জ. সরস্বতীমঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী সরস্বতী (Saraswatimangal Kabyadhara o Debi Saraswati)

ভারতীয় সনাতন সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে সরস্বতী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী ও দেবী। ঋক বেদের সপ্তম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে শস্য ও পুত্রদানকারিণী সরস্বতীর বন্দনা রয়েছে –

"ইয়মদদাদ্রভস্ মৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্রশ্বায় দাশুষে।
যা শশন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি।।"[১৫]

সভ্যতার আদিতে বৈদিক সূক্ত থেকে শুরু করে আধুনিকের কবির হাতেও বারংবার রচিত হয়েছে সরস্বতীর স্তুতিগান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দেবী সরস্বতীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। সরস্বতীর বিবর্তনের ইতিহাসটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নদী রূপে দেবীর প্রাথমিক অবস্থান ও পরিকল্পনার পাশাপাশি এই উপ-অধ্যায়ে সরস্বতী দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসগুলি আলোচনার সমান্তরাল ভাবে ধর্মশাস্ত্র ও মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে প্রতিফলিত দেবীর চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।[১৬] পাশাপশি এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে জাপানি বৌদ্ধ বজ্রযান সাধনের দেবী 'বেনতেন'-এর সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের সরস্বতীর রূপপরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের দেবীদের স্বরূপবিচার

(Fourth Chapter: Onanya Debikendrik

Mangalkabyer Debider Swarupbichar)

বঙ্গদেশের যাপনে দুর্গা, কালীর মতো মহাদেবীরা বহুকাল ধরেই পূজনীয়, চর্চিত। কিন্তু এই অধ্যায়ে আলোচিত দেবীরা বাংলার তথা বাঙালির নিজস্ব ভাবজগতের বাসিন্দা। এঁদের ভিন্নতর রূপের সন্ধান সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও বঙ্গদেশে ও সাহিত্যে এই দেবীরা স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। বিশেষত, মারী-মড়কের ভয় তো কোনো স্থানিক বিষয় নয়, বরং মানুষের বাঁচার ইচ্ছার সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে জড়িত। তাই এই দেবীদের অর্চনা সর্বভারতীয় স্তরে প্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য মঙ্গলদেবীদের মতো এই দেবীরাও বঙ্গদেশের নিজস্ব জল ও হাওয়ায় নিজস্ব স্বতন্ত্র এক রূপ ধারণ করেছেন। এই অধ্যায়ে এই স্বাতন্ত্র্য ও তার অন্তর্নিহিত কারণের অনুসন্ধান করা হবে।

- **ঝ. শীতলামঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী শীতলা**
  (Shitolamangal Kabyadhara o Debi Shitola)

বঙ্গদেশে মধ্যযুগের যাপনে মহামারি ছিল নিত্যসঙ্গী। নাব্যবঙ্গের অধিবাসীরা একদিকে যেমন প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে জর্জরিত ছিলেন তেমনই তাঁদের উপর এসে পড়ত প্রকৃতির কোপ। সেই আদিকাল থেকেই ভক্তি-বিশ্বাস ও দেবকল্পনার রূপায়ণের অন্যতম চালিকাশক্তি হল অজানার প্রতি এক ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম। আর এভাবেই মহামারী-কবলিত বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে জন্ম নেন বিভিন্ন মারীদেবী।[১৪]এই মারীদেবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় দেবী হলেন শীতলা। প্রচলিত শীতলামঙ্গল পালাগুলির এক-একটি আখ্যান স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে নির্দিষ্ট কিছু পালা আছে আবার কোথাও বা সবগুলি পালা নেই।[১৭] নীচে এই আখ্যান সমূহের কয়েকটির সামান্য রেখাচিত্র উপস্থাপন করা হল –

- ১. শীতলার জন্মপালা –১. আদ্যাশক্তির অংশ হিসাবে বৈকুণ্ঠে তাঁর জন্ম,
  ২. নহুষ রাজার পুত্রেষ্টই যজ্ঞের অগ্নিসম্ভব শীতলা,
- ২. শীতলার বিবাহপালা – ব্রহ্মার নির্দেশে পালক পিতা পুষ্পদন্তের গৃহে ঘণ্টাকর্ণ নামে চর্মরোগের দেবতার সঙ্গে বিবাহ হয় শীতলার।
- ৩. অযোধ্যাপূজা পালা – অযোধ্যাতে নিজের পূজা প্রচারের জন্য দেবী শ্রীরামকে স্তুতি-পূজায় তুষ্ট করে নিজের পূজা প্রচার করেন।

এভাবেই নানা কথা, নানা কাহিনির আশ্রয়ে প্রকৃতির রোষের কাছে অসহায় বাঙালি সমাজ স্মরণ করেছে শীতলাকে। আশ্রয় চেয়েছে জ্বরের-রোগের তাপ প্রশমন করে তিনি

হয়তো বা তাঁর নামের মতোই শীতল করে দেবেন শারীরিক যন্ত্রণা, আধ্যাত্মিক অভাব আর অন্তে প্রদান করবেন পারত্রিক মুক্তি। আলোচ্যমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই উপ-অধ্যায়ে শীতলাকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য ঘেঁটে বোঝার চেষ্টা করা হবে দেবীর এই রূপের বিশিষ্টতা।

➢ ঞ. ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যধারা ও দেবী ষষ্ঠী
(Shashthimangal Kabyadhara o Debi Shashthi)

শীতলার মতোই ষষ্ঠীও একজন লৌকিক দেবী। হিন্দু পুরাণের অর্বাচীন কিছু পুরাণে এই দেবীর উল্লেখ থাকলেও ষষ্ঠীর মূল গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ আমরা পাই 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এর প্রকৃতি খণ্ডে। সেখানে মূল মহাদেবী পরমাপ্রকৃতির 'অংশস্বরূপা' দেবী হিসাবে ষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্জারবাহিনী এই দেবীকে কেন্দ্র করেও অন্ত্যমধ্যযুগে যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে সেই মঙ্গল-আখ্যানের বিশ্লেষণে আলোচ্যমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই উপ-অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করা হবে দেবীর এই রূপের বিশিষ্টতা।

➢ ট. কপিলামঙ্গল কাব্য ও দেবী কপিলা
(Kapilamangal Kabya o Debi Kapila)

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর কামধেনু আখ্যানের কাঠামো নিয়ে রচিত হয়েছে কপিলা মঙ্গল কাব্য। এর পাশাপাশি প্রান্তিক জনজাতির 'বাঁধনা পরব'-এর প্রভাবও এই মঙ্গলকাব্যের কাহিনিসূত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। একটিমাত্র স্বল্পায়তন কাব্যের বিশ্লেষণে এই উপ-অধ্যায়ে প্রান্তিক ও কেন্দ্রিক দুই জনসংঘের রুচির আভ্যন্তরীণ অভিঘাতে সৃষ্ট এক দেবীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : বর্তমানের লোক-যাপনে আলোচ্যমান মঙ্গলদেবীদের সামাজিক পরিগ্রহণ

(Fifth Chapter: Bartoman Lok-Japone Alochyoman Mangaldebider Samajik Porigrohon)

দেবী ভাবনা এক সতত পরিবর্তমান নদীর স্রোতের মতো ধারা। আলোচ্যমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে প্রাগার্য কাল থেকে নানা বিবর্তনের পথে হেঁটে দেবীরা মঙ্গলকব্যের আখ্যানের চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। তারপরেও গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল... প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েও আসা লোক-বিশ্বাসে, রিচ্যুয়ালে এই 'টেক-স্যাভি' একুশ শতকেও সেই দেবীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। লোকসংস্কৃতির প্রবহমানতায় সেই দেবীর বন্দনায় কখনও বা জুড়েছে নতুন্ন ধারা। কখনও বা অতীতের ঐতিহ্য আমাদের সামনে এসেছে একেবারে নতুনতর রূপে। এই অধ্যায়ে সেই বিচিত্রতার অনুসন্ধান করা হবে।

মহাদেবীদের যে স্বরূপ মঙ্গলকাব্যে প্রকাশিত তার সঙ্গে আজকের দিনে জনমানসে তাঁদের পরিগ্রহণে জুড়েছে অনেক লোক-উপাদান। বৈদিক 'দুর্গি'র পাশে স্থান পেয়েছেন নবপত্রিকা; যা 'কলা-বৌ' নামেই অধিক পরিচিত। দেবীর প্রকাশ হিসাবে স্থান পেয়েছে বৃক্ষ। এভাবেই বৃক্ষ-বন্দনার লোক-রীতি সমীকৃত হয়েছে বেদ-পুরাণের ভাবনার সঙ্গে। দুর্গোৎসব বাঙালির জাতীয় জীবনের একান্ত প্রকাশ; তাই বাঙালি যেভাবে নিজের কন্যাকে বিবাহের পরে বরের বাড়ি পাঠানোর আগে কনকাঞ্জলির আয়োজন করে; তেমই দেবীকে বিজয়া দশমীর দিন ভোলার ঘরে পাঠানোর আগে তাঁর জন্যও কনকাঞ্জলির প্রস্তুতি নেয়।

শুধু তাই নয়; মায়ের কাছে তাঁর স্নেহের দুলালী কন্যা যেমন নিত্য নবনবায়মান রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তেমনই জগৎজননীকে বাঙালি তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে রূপ দিয়েছে নানা বিভঙ্গে, নানা রূপে। তাই সপরিবার দশভুজা দুর্গার পাশাপাশি শারদীয়া পূজায় কোনো মণ্ডপে দেবী উপস্থিত হন কেবল সখী জয়া-বিজয়াকে নিয়ে। কোথাও বা আবার 'জটাজুট সমাযুক্ত' ঐশ্বর্যমূর্তি পরিত্যাগ করে দেবী আসেন একান্ত বাড়ির মেয়ের মতই দ্বিভুজা 'অভয়া' মূর্তিতে।

মনের মধ্যে যার চিত্র সদা-ভাস্বর বাঙালি সমাজ তাঁকে কেবল মৃন্ময়ী বিগ্রহে নয়, আবাহন করে পটের আধারেও। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি – এই রীতির অন্যতম প্রধান ধারক-বাহক। সেখানে কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে পটের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হন 'বড় ঠাকুরাণী', ষষ্ঠীর দিন আসেন পটের 'মেজ ঠাকুরাণী' আর সপ্তমীর দিনে পটের আধারে আসেন 'ছোটো ঠাকুরাণী'। কেবল মল্লভূমের এই রাজ-পরিবারেই নয় বাংলার বহু সুপ্রাচীন পারিবারিক পূজাতেই এই রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

সাধক-কবি তাঁর গানে লিখেছেন – "কে জানে কালী কেমন/ ষড় দর্শনে না পায় দর্শন"। ষড়-দর্শন তাঁর দর্শন না পেলেও বাঙালি তাঁর নিজস্ব রূপে নিজস্ব ভাবনায় নানা প্রকাশে খুঁজে পেয়েছে নৃমুণ্ডমালিনীকে। বঙ্গদেশে তাই তিনি কখনও শ্মশানচারিণী শ্মশানকালী আবার কখনও বা সর্পভূষণা গুহ্যকালিকা। আবার বৈষ্ণবীয় ধারার প্রভাবকে আত্মীকৃত করে দেবী প্রকাশিত হয়েছেন 'কৃষ্ণকালী' রূপেও।

লক্ষ্মী'র ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সহজেই চোখে পড়ে। বৈদিক 'শ্রী' বা পৌরাণিক 'পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ'-ধারিণী পদ্মালয়া বাংলার ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়িতে সোনার ধানের মধ্যে প্রতীকায়িত হয়েছেন সহজেই। পুথি-পঞ্জিকার বেড়াজাল সরিয়ে সংস্কৃত বচনের গুরুগম্ভীর 'অক্ষরডম্বর' ফেলে রেখে তাই 'পাঁচালি'র সুরে প্রতি সপ্তাহে তাঁর বন্দনা বাঙালির ঘরে-ঘরে।

লক্ষ্মী'র পাশাপশি সরস্বতীর আরাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালির নিজস্বতার ছাপ সুস্পষ্ট। সরস্বতীর পূজার পরের দিন অরন্ধন ও শীতল ষষ্ঠীর পূজার উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে এক বিশিষ্ট রীতির প্রচলন রয়েছে বঙ্গদেশে। এই অরন্ধনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হল সেই ঋতুর বিশেষ তরি-তরকারি-ফুল প্রভৃতি। শাস্ত্রনির্দেশের অবিকল অনুসরণ না থেকে নিজস্ব জল-মাটির গুণে বাঙালির সারস্বত আরাধনাতেও লেগে থাকে মাটির গন্ধ।

ষষ্ঠী, শীতলা, বাশুলী ও কপিলা'র সম্পর্কে এই লোক-প্রভাব আরও ব্যাপক, আরও বিরাট। এই সামান্য পরিসরের আলোচনায় গবেষণার একেবারেই প্রাথমিক স্তরে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা-নির্ভর এই অধ্যায়ে সমকালীন বাঙালির যাপনের সঙ্গে, লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে এই দেবীদের বিবর্তনের ইতিহাস কীভাবে জড়িত – সেটিই অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হবে।

উপসংহার

(Conclusion)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য। একদিকে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে যেমন তথাকথিত নিম্নবর্গের দেবদেবীদের আত্মসাৎ করা হয়েছে বৃহত্তর 'হিন্দু' মান্যতার গণ্ডিতে তেমনই এই শাখার মধ্যে দেবলোকেও লেগেছে মর্ত্যজীবনের স্পর্শ।

প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের চরিত্র নির্ণায়ক বিশেষণ 'মিশ্রসত্ত দেবতা' – এই শব্দবন্ধটি এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 'মিশ্রসত্ত' বলতে আমরা মূলত চারটি উৎসের কথা বুঝে থাকি – ১. স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যধারা তথা পৌরাণিক ধারা, ২. হিন্দু তান্ত্রিক ধারা, ৩. বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারা, ৪. লোকায়ত বা জনজাতিক বিশ্বাসের ধারা। দেবীকেন্দ্রিক প্রধান মঙ্গলকাব্য ধারার (মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা) মতোই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্র নির্মাণেও এই পূর্ব উল্লেখিত চারটি ধারার'ই প্রভাব বিদ্যমান। এই গবেষণায় সেই ধারাগুলির ভিত্তিতে এই দেবীদের গড়ে ওঠার বিচিত্র ইতিহাসকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হবে।

বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্রমশ আমরা মহাদেবী, পৌরাণিক দেবী এবং লৌকিক দেবীদের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করে পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে এই দেবীদের বিবর্তনের ধারায় সমকালীন সময়ে এই দেবীদের সঙ্গে যে লোক উপাদানগুলি সম্পৃক্ত হয়েছে তার আলোচনা করা হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত আকর গ্রন্থপঞ্জি

(*Sanskrit Primary Texts translated in Bengali*)

বাংলা ভাষায় রচিত আকর গ্রন্থপঞ্জি

(*Primary Texts written in Bengali*)

বাংলা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(*Secondary Sources written in Bengali*)

ইংরাজি ভাষায় রচিত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(*Secondary Sources written in English*)

অভিধান

(*Dictionaries and Thesaurus*)